‘সুনীল’ আকাশ দাগ কেটে যায়

সব্যসাচী মণ্ডল

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ছয় দশকের সফল কবি সাহিত্যিক সুনীলদা-সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শেষ হল পৃথিবীর কর্মলীলা, শুরু হল চুলচেরা বিশ্লেষণ। প্রথাগত নাস্তিক কবি ভালবাসার ভাণ্ডকে উজাড় করে গেলেন অগণিত পাঠক সমাজের কাছে। চলে যাব কোন এক চেতনার প্রত্যুষে, খুঁজে নেব ভালবাসার-ভাললাগার একনিষ্ঠ সাহিত্য স্রষ্টাকে, যেখানে যুক্তিবাদী চিন্তা, সংস্কারমুক্ত জীবন সমাজতন্ত্রের স্রোত ধারায় প্রতিবাদী ছন্দহীন ছন্দের জীবনীকার। সীমার মাঝে অসীম।

অর্ধ-শতাব্দীর অধিক বাংলা সাহিত্যের অজাগর, স্তব ও সমালোচনার কেন্দ্রে থাকা এক লেখক-পুরুষ সুনীলদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম ১৯৩৪, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত ছোট গ্রাম ফরিদপুর জেলার মাইজপাড়া। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়েই কলকাতায়, পড়াশুনা হাতিবাগান টাউন স্কুল, সুরেন্দ্রনাথ, দমদম মতিঝিল এবং সিটি কলেজ শেষ করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ তে। পিতা কলকাতা হাতিবাগান টাউন স্কুলের শিক্ষক, মাতা সুগৃহিনী। আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতোই কবির বাল্যজীবন। স্মৃতির অন্দর থেকে কবি নিজেই বলতেন, সবার সঙ্গে দৌড়ে বেড়াতাম, ঘুড়ি উড়াতাম, নানা খেলায় মেতে উঠতাম, এমনকি ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য চাঁদা তুলে ক্লাব বানানো, ফুটবল-ক্রিকেটের প্রতি উৎসাহ না থাকলেও স্কুল ফাঁকি দিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া এসবই ছিল নিত্য ঘটনা। লিখতে লিখতে লেখক, গাইতে গাইতে গায়ক। সুনীলদার লেখক জীবনের প্রারম্ভিককাল ছিল বেশ মজার। সবে বার ক্লাস পরীক্ষা শেষ হয়েছে, পরীক্ষার পর তিনমাস ছুটি। বাবা দুপুরে আটকে রাখার জন্য ইংরেজী কবিতার বই থেকে টেনিসনের দুটি করে কবিতা অনুবাদ করতে দিতেন, বাধ্য ছেলের মতো ডিক্শনারী নিয়ে মনোযোগ সহকারে অনুবাদ করতেন, এভাবে কিছুদিন চলার পর, কবির কথায় ‘...দেখলাম বাবা কবিতা পড়ে দেখেন না, শুধু রাইট দিয়ে আবার নতুন কবিতা দেন, তখন চিন্তা করলাম বাবা যদি না-ই দেখেন তবে শুধু শুধু কষ্ট করে অনুবাদ কেন? নিজে নিজেই লিখে ফেলি।’ এইভাবে প্রতিদিন দুটো করে কবিতা লেখে খাতা ভরতি করে ফেললেন, আর বাবাও রাইট দিয়ে যান। অলস দুপুর নিশ্চিন্ত মন, কবি মন জেগে ওঠে। কবিতার প্রেমে পড়ে যান। এরপর কলেজের দেওয়াল ম্যাগাজিন, কলেজ পত্রিকায় কবিতা ছাপা হয়,

বন্ধুদের সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশ, ১৯৫১তে দেশ পত্রিকায় 'একটি চিঠি' নামক কবিতা প্রথম প্রকাশ পায়, এরপর ১৯৫৩ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় কবির চতুর্থ কবিতা 'তুমি' প্রকাশ-এর পর কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। একই বছর ১৯৫৩-তে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় কবির স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ। প্রথম কবিতা 'নীলীরাগ' তারপর 'হঠাৎ নীরার জন্য' .'ভোরবেলার উপহার' 'সাদা পৃষ্ঠা তোমার সঙ্গে' 'নীরা হারিয়ে যেও না'... প্রভৃতি কবিতা পাঠক হৃদয়ে এক স্থায়ী আসন করে নেয়। গদ্য জগতে প্রবেশ প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ'— (১৯৬৫) দিয়ে, যা দেশ পত্রিকার প্রকাশিত হয়। যদিও তখন কবি গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের প্রথম সারিতে আছে, — 'অমৃত পুত্রকন্যা', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'আমি সে', 'অর্জুন', 'বন্ধুবান্ধব', 'বুকের মধ্যে আগুন', 'ছবির মানুষ', 'ধূলিবসন', 'একা এবং কয়েকজন', 'সুদূর ঝর্ণার জলে', 'জীবন যে রকম', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'কবি ও নতকী', 'মেঘ বৃষ্টি আলো', 'মহাপৃথিবী' প্রভৃতি। সনাতন পাঠক, নীললোহিত, নীল উপাধ্যায় কাব্যনাম, ছদ্মনাম অতিক্রম করে পাঠক হৃদয়ে কেবল সুনীল। ইতিহাস ও জীবনসমৃদ্ধ গল্প ও উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র 'প্রথম আলো' 'মনের মানুষ', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সবুজ দ্বীপের রাজা', আধুনিক ও বাস্তবোচিত। এছাড়া শতাধিক কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, গল্প, ত্রয়ী কাহিনীগ্রন্থ, রূপান্তর কাহিনী, নীললোহিতের রচনা, রম্য রচনা, উপন্যাস সংকলন, আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনী, কিশোর রচনা, প্রবন্ধ/ গদ্যগ্রন্থ, নাটক-কাব্যনাটক, সম্পাদিত সংকলন, নির্বাচিত রচনা, চিঠিপত্র সংকলন, অনুবাদ সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় ২৫০টি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৭২-এ 'আনন্দ পুরস্কার', ১৯৭৯ আকাশবাণী কর্তৃক 'জাতীয় কবি', ১৯৮০-তে 'স্বর্ণকমল', ১৯৮৩ 'বঙ্কিম পুরস্কার', ১৯৮৪ সাহিত্য 'একাদেমী পুরস্কার' ১৯৯৯ 'আনন্দ-স্নোসেম পুরস্কার' কবিকে অহংকারী করেনি, বিনীত করেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বড় বড় পত্র-পত্রিকার লেখক হলেও ছোট পত্র-পত্রিকার পূজারী, ২০০৮ সাহিত্য আকাদেমির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের আন্তঃসম্পর্ক আরো বাড়ানোর জন্য এবং ভারতীয় সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দেবার লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রকল্প নিয়েছিলেন। আসলে গৃহের বৃত্ত উন্মুক্ত করেই বাঁচতে ভালবাসতেন, মানুষ সুনীল, সাহিত্যিক সুনীল ও সাংগঠনিক সুনীল ছিল একসূত্রে গ্রথিত। আসলে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের সার বিশ্লেষণ করলে কতগুলি সহজ সূত্র উঠে আসে। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে ছিলেন নাস্তিক ও পানাসক্ত। তথাপি কোন ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল না। প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামী, ধর্মীয় আচার-বিচার কবিকে ব্যথা দিত, সর্বোপরি জড়বাদী ভাবনার আসক্তি কবিমনকে আধ্যাত্মসত্তার সঠিক কাছে পৌঁছাতে দেয় নি, সেজন্য কবি প্রথমজীবনে রবীন্দ্র অনুরাগী হলেও মধ্যজীবনে রবীন্দ্র বিরাগী হয়ে পড়েন, যদিও পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথের ঋষি সত্তাকে উপলব্ধি করেন এবং ভুল বুঝতে পারেন। সুনীল অনুরাগী অনেক পাঠক লেখক, অগ্রজ-অনুজ মনে

করেন বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী নোবেলের অধিকারী সুনীল হতেন যদি তিনি আধ্যাত্মবাদী হতেন, জড়বাদী-ভোগবাদী না হয়ে। তথাপি মানুষের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস, ঔদার্যতা কবি সুনীলকে মানুষের দরবারে আপন করেছে। আসলে কবি সত্তাকে অস্বীকার করে মানুষকে ভালবাসাই প্রকৃত ধর্ম মনে করেছেন। সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলা, সহিষ্ণুতা, সকলের ভাল চাওয়া এই মহৎ গুনগুলি সুনীলকে আরো 'সুনীল' করেছে। যেমন— যারা বয়সে ছোট নতুন লেখালেখি করছে, তাঁরা যাতে লেখক হয়ে উঠতে পারে, খেয়ে পরে বাঁচতে পারে সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন, সাহস দিতেন, উৎসাহ যোগাতেন। একটি চারাগাছ মহীরুহ বৃক্ষ হতে পারে, সে বৃক্ষের ছায়ায় কত তনু-মন-প্রাণ আশ্রয় পেতে পারে তার নমুনা একমাত্র সুনীল গাঙ্গুলী।

আসলে কতকগুলি দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্য সুনীলের জীবনধারাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল, যা অজান্তেই জানার পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে, তা আমরা কবির কতকগুলি স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে জানতে পারি। আসলে নাস্তিকতা একধরনের আস্তিকতা। স্রোত স্বীকার করেই স্রোতের বিপক্ষে যেতে হয়। আমি 'নাস্তিক' তখনই যখন আমি আস্তিকতাকে যুক্তি-চেতনা দিয়ে অস্বীকার করতে পারব। আর সুনীল সেটা করতে গিয়ে বার বার আস্তিকতার সজল সলিলে নিক্ষেপিত হয়েছেন। যেমন কবি নিজেই লিখেছেন—

"ধর্ম বা ঈশ্বর চিন্তায় মন দিইনি কখনো
তাতে বাঁচিয়েছি অনেকটা সময়
সেই সময় নিয়ে মাথা খুঁড়েছি ছন্দ মিলে
শব্দের প্রতিবেশী শব্দ
ধ্বনির পাশাপাশি ধ্বনি..."

আবার একটা কবিতায় বলেছেন—

'এ হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কী এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি।'

আবার গল্পসম্ভারে গল্পকার সুনীল লিখছেন: 'কাছেই একটা মসজিদ। সকাল সন্ধ্যা আজানের সুর শোনা যায় মাইক্রোফোনে। হাজু আগে কখনো মাইক্রোফোনে আজান শুনে নি। এই সুর শোনামাত্র তার রোমাঞ্চ হয়, যেন বেহেস্ত থেকে স্বয়ং খোদা মালিকের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।'

গল্প বা কবিতায় ধর্ম, ঈশ্বর চিন্তা, পাপ-পুণ্য, আজান, খোদাতালার কণ্ঠস্বর— এই শব্দগুলির ব্যবহার একমাত্র তিনিই করতে পারেন যিনি এর অর্থ, প্রয়োগ সুস্পষ্টভাবে জানেন। এখানেও কবি আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কেননা ধর্ম কোন মন্দির-মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়, স্বামী বিবেকানন্দের পরিভাষায় ওগুলো এক-একটা বাড়ি, কালের নিয়মে ভেঙে পড়বে, হারিয়ে যাবে। থাকবে মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি

'চৈতন্যশক্তি', যা সর্বব্যাপী-অসীম। আসলে প্রাচীন ধর্মে বলা হত যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তারা আস্তিক, পরবর্তী দার্শনিক চেতনার উত্তরণে দার্শনিকভাবে সত্য প্রমাণিত হল যারা বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে তারা আস্তিক, আর স্বামীজী সেই চেতনার আধুনিক রূপ দিলেন— 'যারা নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাঁরাই আস্তিক'। সেই আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আর সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে হৃদয়বান সুনীল লিখলেন: 'আমি মাটি ছেড়ে দশতলা উঠে ফের মানুষের জন্য হাহাকার করি।' শুধু তাই নয় নাস্তিক সুনীল লিখলেন: 'আমার নরক সত্যিই ভালো লাগে না। আমি স্বর্গে ফিরে আসতে চাই।' একজন মহৎ-উদার-হৃদয়বান ব্যক্তিই একথা বলতে পারে, যার প্রকৃত উপলব্ধি হয়েছে। কথিত সুনীলের ব্যক্তিজীবন অসংযত, পানাসক্ত, সাধারণ নীরাদের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন। যদি একথা সত্যি হয়েও থাকে তথাপি সুনীলের আত্মপোলব্ধি, ভাল-মন্দের বোধ, মন্দ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, পবিত্র জীবন (স্বর্গ)-এ ফিরে আসার আকুতি কবিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, সেইজন্যই তিনি লিখতে পেরেছিলেন: 'সব দুঃখই পবিত্র নয়। সব স্বপ্ন অপরকে জানাবার মতো নয়, সব রাস্তা রোমে যায় না, সব প্রেম নারীর প্রতি নয়, সব সাদা কাগজই মলিন হতে চায় না, সব জানালা খোলা সম্ভব নয়, সব কবিই বিশ্বাসঘাতক নয়।'

বস্তুবাদী কবি ভাবজগতের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কামনার জগতে হাবুডুবু খেয়েছেন এবং বিবেকের কষাঘাতে বার বার নরকের সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গের সিঁড়িতে উঠে এসেছেন। কেননা সুখের অনুভূতি তখনই বাস্তব যখন তিনি দুঃখের মধ্য দিয়ে সুখকে অর্জন করেছেন। বাস্তব জীবনের স্বর্গ-নরকের অভিঘাত কবি সুনীলকে খাঁটি সুনীল করেছে। তাই তিনি 'স্বর্গের কাছে' কবিতায় লিখলেন:

'কত দূরে বেড়াতে গেলুম, আর একটু দূরেই স্বর্গ
দু'মিনিটের জন্য দেখা হল না
হঠাৎ ট্রেন হুইশল দেয়
খুচরো পয়সার জন্য ছোটাছুটি
রিটার্ন টিকিটে একটি সই
আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি!
এত কাছে, হাতছানি দেয় স্বর্গের মিনার,
..... সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেন
আমায় লুফে নেয়
পাপের সঙ্গীরা হা-হা-হা-হা করে হাসে
দেখা হলো না, দেখা হলো না, আমার
এই শব্দ— অস্তিত্বকে অভিমানী করে
আমি স্বর্গ থেকে আবার দূরে সরে যাই।'

আসলে সুনীলবাবু ছিলেন উদার প্রকৃতির মানুষ। হৃদয়, মন ও বাড়ির দরজা ছিল সকলের জন্য খোলা। প্রিয়জন, প্রিয়জনের প্রিয়জনদের জন্যও কবি ও কবি পত্নী আতিথ্যের ভার সাদরে গ্রহণ করতেন। ফলে দেশি, বিদেশী লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা, চিত্রকর, চিত্রপরিচালক, নায়ক-নায়িকা এমনকি ইউরোপের ভিন্ন দেশের মেমরাও ভিড় করতেন। তবে অতিথি আপ্যায়নে ত্রুটি না থাকলেও সকলের মন রাখতে গিয়ে বহুবার নাজেহাল হয়েছেন কবি, কবি পত্নী। কাছের বন্ধু এমনকি অনুরাগী পাঠক-লেখক-লেখিকা প্রশ্ন তোলেন, এত অতিথি আপ্যায়ন, বিভিন্ন সভা-সমিতি, পত্রিকা দপ্তর, অফিস, সেন্সর বোর্ডের দায়িত্ব, বিভিন্ন বিচারক (চলচ্চিত্র), সাহিত্য সভায় যোগদান, বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা, বিদেশের ডাক— এতসব সামলে তিনি লেখার সময় পেতেন কিভাবে? তার সাথে আগ্রাসী পড়ার নেশা। একবার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সুনীলবাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায়, উত্তরে হাসতে হাসতে বলেন 'আমি রাত জেগে লিখি না, লিখি সকালে, তাও মাত্র দু আড়াই ঘণ্টা।' সেখানেও প্রশ্ন এও কি সম্ভব? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে এরূপ প্রশ্ন বিভিন্ন সময় এসেছে, কিন্তু তার উত্তরে জীবনদর্শনের পূর্ণাবয়বে আদর্শের নিরিখে ঋষি কবির সম্ভবতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরসূরী অনুরাগী পাঠক সমাজ। কিন্তু সুনীলবাবুর জীবন দর্শন কবিগুরু বিপরীতমুখী হলেও সময়ের ব্যবধানে, ভালবাসা-নিষ্ঠার আগ্রাসনে কবি-সাহিত্যিক সুনীলবাবুর ক্ষেত্রেও সম্ভব হয়েছে। আসলে সুনীলবাবু জড়বাদী- ভোগবাদী-নাস্তিক হলেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস নিয়েই তিনি বলতেন 'ইউনিভার্স ইজ ইন্টেলিজেন্ট'। বিভিন্ন আলাপচারিতায় এর প্রমাণ সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। দুই বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বয়সে সামান্য হেরফের থাকলেও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা ও আন্তরিকতায় ছিল মহৎ হৃদয়। শীর্ষেন্দুবাবু পূর্ণ আস্তিক, আচারনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক মানুষ, মাঝে মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক হতো, বিশেষত জীবনমুখী-জীবনচর্চা বিষয়ে। শীর্ষেন্দুবাবুর কথায়: 'সুনীলের বড় গুণ ছিল, ও তর্ক করতে ভাল বাসত না। তবে মহাজগতের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যখন কথা হত, তখন সুনীল বিশ্বসত্তার অস্তিত্বের কথা সহজেই মেনে নিত।' হাসতে হাসতে সুনীল বলত: 'আমি ভাবছি এবার নিরামিষ খাব, সিগারেট ছেড়ে দেব, ড্রিংকস ছেড়ে দেব।' চেষ্টা করত, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীদের আবদারে আবার ধরে ফেলত। সকালে আমি (শীর্ষেন্দু) পুজো পাঠ করতাম, সুনীল নীরবে দেখত। সুনীল সেবার দেওঘরে ঠাকুর (অনুকূল)-এর জন্মোৎসবে বক্তৃতা করে ভক্তদের মুগ্ধ করেছে। আবার দেখেছি আমার শুদ্ধাচারের প্রতি সুনীল ও স্বাতীর কত ভক্তি-নিষ্ঠা! আটাত্তরের বন্যায় একবার সুনীলের বাড়িতে রাত্রে থেকে গেলাম, নিরামিষ স্বপাক রান্না থেকে সাত্ত্বিক প্রতিটি বিষয়ের প্রতি সুনীল-স্বাতীর আন্তরিকতা আজও মুগ্ধ রেখেছে।'

সুনীলবাবুর অপর এক কাছের মানুষ ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সুনীলকে ভাই বলে তুই সম্বোধনে ডাকতেন। কৃত্তিবাস পত্রিকায় 'সুনীল আমার ভাই' প্রবন্ধে নীরেন্দ্রবাবু লিখছেন: 'অনেকে আলগাভাবে বলে সুনীল ধর্মে বিশ্বাস করত না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমি সুনীলকে বলতাম, ধর্ম মানেই কি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম? একদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করার স্পর্ধা দেখায়। ধর্মের আর একটা দিক আছে— সেই দিকটা হল ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করেও— কাউকে ঠকাবে না, মিথ্যা কথা বলবে না, বয়স্ক-অসুস্থদের দেখবে, অন্যের জিনিসে লোভ করবে না ইত্যাদি। আসলে সুনীলের ধর্ম ছিল মানবধর্ম। মানুষকে ভালবাসত, মানুষও সুনীলকে ভালবেসেছে। তার নমুনা শেষ যাত্রা।'

আসলে সমাজে একশ্রেণির মানুষ থাকে, যারা নিজেদের ভোগ-বিলাসে উন্মত্ত রাখে কিন্তু সংযম জীবন ভালবাসে। এরা বক ধার্মিক সাজতে তথা বক ধার্মিকদের দেখতে পারে না, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে। সেই ব্যক্তিদের দলে সুনীলের বিচরণ। এ প্রসঙ্গে এবারের (২০১৩) পূর্ণকুম্ভ-এ পুণ্য কুম্ভস্নানের গুরুত্ব বিষয়ে এক সাধুর সঙ্গে সাহিত্যিক সমরেশ বসুর বেশ কিছু কথা হল, কথার সারমর্ম এরূপ: 'পূর্ণকুম্ভে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি সাধারণ লোক, সাধু-সন্ন্যাসী আসে পুণ্য অর্জন করতে, সত্যিই কি পুণ্য অর্জন হয়? স্মিত হেসে সাধুজী বলেছিলেন 'আপনিই তো সাহিত্যিক সমরেশ বসু, আপনার লেখা 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', আমি হৃষীকেষে থাকি। তবে মনে রাখবেন— যে সৎ কর্ম করে না, সদাচার যার নেই, সে সহজীবীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেন না, যার ইন্দ্রিয়াদি নিয়ন্ত্রিত নয়, বাক-ব্যবহার, চিন্তা যার শুদ্ধ হয় নি— তার কুম্ভের পুণ্যস্নান কী-লাভ করতে পারে। বহিরঙ্গের স্নান প্রতীক মাত্র। আত্মশুদ্ধির জন্য বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে গিয়ে তপস্যার প্রয়োজন নেই। যিনি নিয়ামক পুরুষ, তাঁর অধীনে নিত্য নিজেকে অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত করলেই ওই পুণ্যস্নান মানুষকে পবিত্রতা দান করতে পারে।'

সুনীলবাবুর হয়তো সবগুণ ছিল না, কিন্তু মানুষ সুনীলকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই খবর রাখেন— এই মানুষটির হৃদয়বত্তা কত গভীর ছিল। অর্থী-প্রার্থীকে ফেরান নি কোন দিনও। বেকার ছেলেদের জাহাজভাড়া ও নগদ একহাজার করে টাকা আন্দামানে পাঠিয়েছিলেন চাকুরী ও কর্মে যোগদানের জন্য। গাঁয়ের গরীব মেয়েদের সাহায্যার্থে বনগাঁ-এ 'পথের পাঁচালী' নামে সংস্থা গড়ে তোলেন। সুনীলের অনুভবে প্রত্যেকেই কোন না কোন গুণে বড়ো, এই মর্যাদায় গোপনে কত মানুষকে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আসলে সুনীলবাবু একদিকে বড় মাপের লেখক ও অন্যদিকে বড় মাপের মানুষও ছিলেন।

এবার ভাববাদী চেতনা থেকে বস্তুবাদী চেতনায় আসা যাক, সেখানেও সত্য ও সততার পরিচয়কে সার্বজনীন করতে গিয়ে সুনীল প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা ও ভাললাগার

গণ্ডীকে লাগামহীনভাবে রাখতে চেয়েছিলেন। কল্পনার তুলিতে নীরার ছবি আঁকতে গিয়ে মনের গভীরে অবচেতন মনে সুনীলবাবু বহুগুণ সমন্বিত একজন রমণীর ছবি এঁকেছেন। সেকথার পরিচয় আমরা সুনীল সহধর্মিনী স্বাতীদেবীর মুখের কথায় পাই: 'অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি, আমি মোটেই নীরা নই। নীরা কি মাত্র একজন মানুষ হতে পারে কখনও। আমার মনে হয়, নীরার মধ্যে অনেক মেয়ে মিশে রয়েছে। আমি কখনো নিজেকে নীরার সঙ্গে মেলাতে চাই নি। সুনীল যে নীললোহিত তা যেমন বলা যায়, আমাকে কখনোই নীরা বলা যায় না। আমি স্বাতী হয়েই থাকব। তাই আমি চেয়েছি, নীরা থাক 'নীরা' হয়েই, থাক রহস্যে ঢাকা, থাক সকলের অচেনা। আমি সুনীলের স্বাতী।' সুনীল থেকে নীললোহিত, নীললোহিত থেকে সুনীল— সংসারের অজানা, অচেনা ব্যথার কিংবা সুনীলকে খাঁটি 'সুনীল' হতে সাহায্য করেছে সহধর্মিণী স্বাতীদেবী। আসলে ভালবাসার আর একনাম বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসকে নিয়ে স্বাতীদেবী শেষদিন পর্যন্ত পাশে ছিলেন অনেক চাওয়া-পাওয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু তারমধ্যে ভালবাসার কষ্টিপাথরে সুনীলকে চিনতে ভুল হয়নি। তাই স্বাতীদেবী অভিমান করে মানুষের দরবারে ঘোষণা করলেন: 'সুনীল আসলে এক নিঃসঙ্গ, উদাসীন মানুষ, পৃথিবী তাঁকে চিনতে পারলো না।' জাগতিক সমস্ত দুঃখ, বেদনা, আশা-প্রত্যাশা নিয়েই কবির জীবন। সেক্ষেত্রে সুনীলবাবু ব্যতিক্রম নয়, সেইজন্য বস্তুবাদী চেতনার ভোগবাদকে উপেক্ষা না করেই হয়েছিলেন 'রমণীমোহন'— মেয়েদের কাছে ভারী প্রিয়, অনেক রমণী ওর জীবনে এসেছে। কিন্তু ভাববাদী চেতনার কাছে, আদর্শবোধের কাছে পরাজিত হয়ে সুনীল হয়েছিলেন 'সাদাবাঘ'। তথাপি প্রাণখোলা, বন্ধুবৎসল, উদারচিত্ত, উপকারী, আনন্দময় সুনীল 'না' বলতে না পারার অভ্যাস— এই মানবিক সুনীলকে কজন বা চিনেছে, কজনই বা চেনার চেষ্টা করেছে। কারণ চেনার কাজটা সহজ নয়, স্বীকার করতেই হয়।

শুধু তাই নয়, যে কথা বলে স্মৃতি তর্পণ সমাপন করব তাহল সুনীলবাবু মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি টান। কেননা আমেরিকায় থাকাকালীন ফরাসী মহিলা কবির সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমেরিকার মানুষের ভালবাসা, সেই সঙ্গে পাকাপাকি চাকুরীর ব্যবস্থা, যুবক কবিকে আটকে রাখতে পারতো। কিন্তু কবির কথায়: 'রাত্রে একাকী যখন, মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, তখন দেশের জন্য মন কাঁদত, উঠে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে একটা কবিতা লিখে ফেলতাম।' দেশের টান ও বাংলা ভাষার জন্য কবি ঘরমুখো হলেন। এই টান ও ভালবাসাই কবিকে বাংলার মাটি, জল, বাতাস কালজয়ী সাহিত্যিক করে তুলেছে। আসলে সুনীলবাবু ছোট-বড় সবার জন্য হৃদয়, মন উজাড় করে দিয়েছেন, বিনিময়ে কিছুই চান নি। অনেকেই বলবেন বাংলা ভাষার জন্য, বাংলা সাহিত্যের জন্য এত বেশি পৃষ্ঠা কেউ লেখেন নি। তিনি বলতেন 'আমার যাবতীয় চিন্তা এই একটি মাত্র জীবন নিয়ে', মৃত্যু অনিবার্য জেনেও, অমরত্বকে তুচ্ছ করেছেন। ভাব ও বস্তু চেতনার

অসম লড়াই, এত সম্মান ও পুরস্কারের পরেও কবি পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারার দুঃখ ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, তথাপি সান্ত্বনা একটাই কবিতা সুনীলকে ছাড়ে নি। তাই মৃত্যুঞ্জয়ী কবি হাসিমুখে লিখলেন—

'একজন মানুষ মুক্তিফল আনতে গিয়েছিল
সে বলেছিল আমি ফিরে আসবো
প্রতীক্ষায় থেকো।'

ঋণস্বীকার:

১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— শ্রেষ্ঠ কবিতা, গল্প, আত্মজীবনী
২। কৃত্তিবাস— সুনীল স্মরণ সংখ্যা— বইমেলা-২০১৩, সম্পাদক— স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়
৩। প্রসাদ পত্রিকা ৪৬ বর্ষ, ডিসেম্বর সংখ্যা-২০১২
৪। দেশ পত্রিকা— ৮০বর্ষ ১ম সংখ্যা— ২ নভেম্বর ২০১২ সংখ্যা